কথোপকথনে তরুণ কবি বিনায়ক

অনুলিখন: মোনালিসা মুখার্জী ও কৌশিক দত্ত
EMAIL: monamukherji@gmail.com
kausik.datta@gmail.com

কর্মব্যস্ততা, নিত্যনৈমিত্তিক কাজের ফাঁকে, "কখনো সময় আসে, জীবন মুচকি হাসে..." আর ঠিক সেই 'পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা'-র মতো সন্ধান মিলে যায় দারুণ কোন অভিজ্ঞতার। সেরকমই একদিন আকস্মিক সুযোগ পাওয়া গেল তরুণ কবি বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোমুখি বসে সন্ধ্যে জুড়ে অনাবিল আড্ডা দেওয়ার। কলকাতা বোর্ড ও পালকির তরফ থেকে আমরা তিনজন হানা দিলাম কবির বাড়ীতে, অকৃতদার কবি এবং তাঁর মাতৃদেবীর উদার আপ্যায়ণে অভিভূত হলাম; তারপর চলল জোরকদমে আড্ডা এবং কবি বিনায়কের পিছনে মানুষ বিনায়ককে ভাল ভাবে জানার প্রচেষ্টা।

কথা শুরু হলো কবির জীবনে তাঁর অধুনা স্বর্গত পিতৃদেবের ভূমিকা নিয়ে। বিনায়ক বললেন কেমন ভাবে তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে একটা আত্মসমাহিত, laid-back attitude, পেয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রে, এবং তারই ফলে তিনি লেখালেখির কথা চিন্তা করতে পেরেছেন। জানতে পারলাম, কেমন করে ছোটবেলায় পাড়ার দাদার কাছ থেকে কবিতার বই নিয়ে পড়ার মধ্যে দিয়ে কবিতায় হাতেখড়ি হয়, যদিও সেই সময় সেই সব কবিতা একেবারেই পছন্দ হয়নি বা বুঝে উঠতে পারেননি। হায়ার সেকেণ্ডারিতে পাঠরত অবস্থায় ভিতর থেকে এল সেই কবিতার তাগিদ, যা আজও তাঁকে পরিত্যাগ করে যায়নি। ঐ সময়তেই তাঁর দেশ পত্রিকা ও সানন্দায় একটা দুটো কবিতা ছাপা হয়। সেই শুরু হলো পথচলা।

বিনায়ক একজন আপাদমস্তক বাঙ্গালী, এবং বাংলা ভাষাকে আন্তরিক ভাবে ভালবাসেন (যদিও কর্মজীবনে তিনি ইংরেজীর শিক্ষক) – এতটাই ভালবাসেন যে

কোন প্রবাসী বা ভিন্নপ্রদেশবাসী বাঙ্গালীর সাথে পরিচয় হলে, যদি দেখেন যে তিনি বাংলা ভাষাটা তেমন জানেন না, সেটা বিনায়ককে কষ্ট দেয়। তিনি মনে করেন যে সমভাষাভাষী দুই ব্যক্তির মধ্যে যেমন সহজেই একাত্মতার বোধ গড়ে উঠতে পারে, তেমনটি হয়তো আর কিছুতে হয়না। এই বাংলা ভাষার সঙ্গে বিনায়ক-এর অস্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, এতটাই যে কখনো কোন কোন পরিস্থিতিতে তিনি বেশ বিব্রতবোধ করেন। যেমন স্বর্গত পিতার মরদেহের মুখাগ্নি করার সময়ও তাঁর মাথার মধ্যে কবিতার পংক্তি ঘুরছিল, এবং শোকবিহ্বল কবি তখন সেটাকে শব্দের অভিশাপ বলে জ্ঞান করেছেন। তবে সেই কবিতাটির মধ্যে দিয়েই পরবর্তীকালে বিনায়ক নিজের যন্ত্রণার কথা এবং মানুষের নশ্বরতা সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধির কথা প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, "...আগুনের যেন শরীরে একটা essence আছে, একটা scent আছে, যা আসলে মানুষের জীবনের সুগন্ধ, যা কিনা সে মৃত্যুর পর শুষে নেয়... যেন, আগুন মেখেছে তার অঙ্গবাসে দেলখোশ"। শোকের মূর্ছনায় বিনায়ক তার পরে তিন মাস কিছু লিখতে পারেননি, কিন্তু শব্দ, ভাষা, তাঁর কাব্যময় জগৎ, তাঁর অস্তিত্ববোধের অবলম্বন হয়ে রয়ে গেছে। ভাষাসাধনায় সমাহিত বিনায়ক তাই দৃঢ়প্রত্যয়ে বলতে পারেন যে কবিতার ক্ষেত্রে, লেখা লেখি-র ক্ষেত্রে তিনি কখনো কোন ফাঁকি দেননা। তিনি তাঁর সমস্তটুকু নিংরে কবিতাকে, এবং সাহিত্যকেও দিয়েছেন। ফলে তাঁর লেখাটা যারা ভালবাসবেন, তাদের কাছ থেকে তাঁর নিজের জন্যেও সেই ভালবাসাটুকু পেতে তিনি চান। ভালবাসার কাঙ্গাল কবি খুব একটা খ্যাতির মুখাপেক্ষী নন, সর্বসাধারণের কাছে শুধুমাত্র মুখপরিচিতি তাঁর কাম্য নয়। আড়ালে থেকে কবিতার মধ্যে দিয়ে তাঁর অভিব্যক্তিগুলো প্রকাশ করে যেতে পারলেই তিনি খুশী। মানুষজনের সঙ্গপ্রেমী বিনায়কের পাঁচ জনের সাথে আড্ডা দিতে খারাপ লাগে না, কিন্তু কোন ব্যক্তি, যিনি কখনও কবিতা পড়েন নি, শুধুমাত্র অনুষ্ঠানাদি বা দূরদর্শনে বিনায়কের উপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ওপর মূল্য আরোপ করতে চান, সেরকম লোকের কাছ থেকে তিনি শতহস্ত দূরেই থাকতে চান, লুকিয়ে রাখতে চান নিজেকে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়ে যে রাগ, যে তেজ, যে vigor, যে পৌরুষ আছে সেটা বিনায়ককে খুব উদ্বুদ্ধ করে, চমৎকৃত করে। আজকের সমাজে পরিচিত মানুষজনকে নিয়ে অনেক সময় যে অস্বাস্থ্যকর আলোচনা হয়ে থাকে, তাকে কেন্দ্র করে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, “কে কার পাশে ঘুমোন সেটা একেবারেই গৌণ; দেখব তিনি কোথায় জেগে, কোথায় নন মৌন”। তুচ্ছ, অযৌক্তিক বিচার এবং কাদাঘাঁটা মানসিকতার উর্দ্ধে উঠে মানুষে সারবত্তার এই মূল্যায়ণ বিনায়ককে নাড়া দিয়েছিল। তার সাথে জীবনকেন্দ্রিক, সাধারণ মানুষের ভাব ভালবাসা যন্ত্রণা নিয়ে লেখা সুমনের গান তাঁকে অল্পবয়স থেকেই বিশালভাবে প্রভাবিত করে। তবে আরও অনেকের অল্পবিস্তর প্রভাব তাঁর উপর পড়লেও, তিনি কবিতায় একটা স্বকীয়তা রাখায় বিশ্বাসী; তাঁর লেখনীর যে একটা নিজস্বতা আছে, সেটা তিনি ঈশ্বরের এবং তাঁর স্বর্গত পিতৃদেবের আশীর্বাদ বলেই মনে করেন। অন্য কারুর influence জাঁকিয়ে পড়ে গেলে, সেটা থেকে মুক্ত হওয়া খুবই মুশকিল, এবং সেই কারণেই অন্যান্য কবিদের সঙ্গে কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে তিনি খুব একটা আরামবোধ করেন না। প্রত্যেক সৃষ্টিধর্মী মানুষেরই নিজস্ব একটা জগৎ থাকে, এবং একজন কবি হিসাবে তাঁর জগৎ অন্যজনের জগৎ থেকে ভিন্ন না হলে একজনের অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। এই বিভাজনটা বিনায়ক খুব সতর্ক ভাবে মেনে চলেন। জগতের নিয়মানুসারেই এই ব্যতিক্রমী চিন্তাধারার মাশুল বিনায়ককে দিতে হয়েছে। অনেক কাব্যসম্পাদকের মুখোমুখি হয়েছেন, যারা এই ব্যতিক্রম পছন্দ না করে চেষ্টা করেন যে তাঁদের উত্তরসূরীরা তাঁদেরই বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট পথে চলবে, গুরুশিষ্যর মধ্যে মন্ত্রবন্ধনের মতন। সে পথে না হেঁটে বিনায়ক বরাবর চেষ্টা করেছেন তাঁর জোরের জায়গাটুকু আঁকড়ে ধরে রাখার, তাঁর স্বতন্ত্রতাকে বাঁচিয়ে রাখার।

প্রশ্ন রেখেছিলাম কবির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে – কবি হয়ে উঠতে গেলে যে একটা বিশেষ ভাবে চারপাশের পৃথিবীকে দেখতে পারার ক্ষমতাটা থাকার দরকার, সে কি সহজাত, না চেষ্টার মাধ্যমে আয়ত্ত করা যায়? বিনায়কের স্বচ্ছ উত্তর, যে

অনুভব করলেই লেখা যায়; যদিও অনেকেরই এই “আমি কবি” বোধটা নিয়ে একটা প্রচ্ছন্ন অহংকার থাকে, কিন্তু বাস্তব জীবনে প্রত্যেকটা মানুষই কোন না কোন সময় কবি। একজন চাষী, একজন রিক্সাচালক, তারা এক একটা মুহূর্তে এমন একটা কথা বলতে পারে, যে যেন একটা কবিতার বীজবপন করে গেল। যেরকম অনেক কবিতা তিনি ওদের কাছ থেকে পেয়েছেন। অনেকেরই এটা হয়ে থাকে, যে এমন দু’তিনটে শব্দ বা লাইন আপনা থেকেই মাথায় আসে, যাতে মনে হয়, বাহ! এ তো চমৎকার। কিন্তু কবি ব্যতিরেকে সাধারণ মানুষের তারপর কাজের চাপে, বা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সেটা কে আর অনুসরণ করা হয় না, সে জিনিসটা কোথাও একটা মিশিয়ে যায় বা হারিয়ে যায়। যে কারণে প্রিয় কবির লেখাপাঠ করে পাঠকের হামেশাই মনে হয়, আরে! এই কথাটা তো আমারও কথা; অর্থাৎ ওই কথাটা পাঠকেরও ভেতরে কোথাও ছিল।

এই মুক্ত, উদার দৃষ্টিভঙ্গিই বিনায়কের সম্পদ, তাই তিনি নিজেকে কবি বলে অতটা মহার্ঘ status দিতে চাননা। তিনি মনে করি না যে তিনি কবি বলেই তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক বাস্তব জীবনের প্রতিটা মুহুর্তে তিনি কবি। কবি শঙ্খ ঘোষের লাইন উদ্ধৃত করে বিনায়ক বলেন, তিনি তো প্রত্যেক মুহুর্তে কবি নন, হতে পারেননি; রিক্সাভাড়া আট টাকার জায়গায় বারো টাকা চাইলে তিনি প্রতিবাদ করেন। প্রত্যেকটা মুহুর্তের দরাদরি, জীবনের অহরহ প্রত্যেকেরই কোন না কোনভাবে কিছু লড়াই, বাসের হাতলটা ধরে একটু দাঁড়ানোর জায়গা করে নেওয়া, এটা করেই তো বাঁচতে হয় সকলকে। সেকারণেই বিনায়ক “আমি কবি, আমি সকলের থেকে আলাদা” এই যুক্তির পরিপন্থী।

কবিতা লেখাটা বিনায়কের ভালবাসার কাজ। তিনি জানেন যে জোর করে কবিতা লেখা যায়না, তাই জীবনে একটিও কবিতা জোর করে লেখেননি। জীবনের নানা উত্থানপতনের সময় অন্তরস্থিত ফল্গুধারার মত বহমানা কবিতার চোরা স্রোত হৃদয় চিড়ে দুকূল ছাপিয়ে বেড়িয়ে এসেছে। বানিয়ে কবিতা লেখা আর মরতে মরতে কবিতা লেখার মধ্যে যে বিশাল পার্থক্য, সেটা উপলব্ধি করেছে, দুঃখ ও সুখের চরম মূহুর্তগুলোকে ভাগ করে নিয়েছেন অগণিত পাঠককূলের সঙ্গে;

সময়বিশেষে প্রকাশক, সম্পাদকের চাহিদাও তাতেই মিটে গেছে। ভাল একটা কবিতা লিখে ফেললে নিজেই খুব বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থেকেছেন, অবয়বপ্রাপ্তির পরে সেই কবিতা যেন তাঁকে অসহায় করে রেখে নিজসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কয়েকটা শব্দের সমাহার কখন কবিতা হয়ে গেছে, অনেক সময় কবি নিজেও তা সঠিক অনুধাবন করে উঠতে পারেন না।

সৃজনীক্ষমতা কখনো হয়ত শুকিয়ে যেতেও পারে, এই নিয়ে বিনায়কের কখনো ভয় বা আশংকা হয় কিনা জানতে চাইলাম। প্রশ্ন ছিল, যে একদিন হয়ত ঘুম থেকে উঠে প্রতীত হলো যে সমস্ত কবিতা হারিয়ে গেছে, আর আসছে না, সেরকম দিনটার কথা কখনো মনে হয় কিনা। কিন্তু তরুণ কবির উচ্ছ্বাস তো অদম্য! বিনায়কের পরিস্কার স্বীকারোক্তি, সেই কারণেই তো নিজের কবিসত্ত্বাটাকে অতো বাড়িয়ে ধরেননা। কবিতা লেখার ক্ষমতাটাকে মনে করেন একটা ঈশ্বরদত্ত আকস্মিকতা, একটা পরম্পরা নয়। আশা ভোঁস্‌লে কিংবা লতা মঙ্গেশকার কোন দিন গান গাইতে ভুলবেন না, কিন্তু কবের ক্ষেত্রে আজকে লিখতে পারছেন, কাল যদি না পারেন? কাল হয়ত এমনই কবিতা লিখলেন যে দশটা শব্দ পড়ে মনে হল, এ কি! অখাদ্য! এমনটা যে হতেই পারে জীবনে, সেটা কবি জানেন, আর তাই সেই চিন্তাটা খুব আসতে দেননা, লুকিয়ে রাখেন। সেই জন্য বিনায়ক মনে করেন, কবিতা চলে যাবে কি কবিতা থাকবে, এটার কোন public effect তাঁর জীবনে পড়বে না, তা সে ব্যক্তিগত জীবনে যতই না খুব ভেঙ্গেচুড়ে যান।

প্রশ্ন মনে আরও অনেকই ছিল, কিন্তু রাত্রি বেশী হয়ে যাবার দরুণ, এবং দূরদূরান্তে বাড়ী ফেরার তাগিদে অনিচ্ছা সত্বেও সেদিন কবির কাছ থেকে উঠে আসতে হল।